তারিখ OCT 05 2006
পৃষ্ঠা : ৭ কলাম ৮

বিশ্ব শিক্ষক দিবস-২০০৬ : শিক্ষক ম্যাগনাকার্টা স্বাক্ষরের ৪০তম বার্ষিকীতে

কেন বিশ্ব শিক্ষক দিবস?

ম. আখতারুজ্জামান

চার দশক আগে ১৯৬৬ সালের ৫ অক্টোবর ইউনেস্কো ও আইএলও'র উদ্যোগে প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয় 'শিক্ষকদের অধিকার ও মর্যাদা বিষয়ক একটি বিশেষ আন্তঃসরকার সম্মেলন।' এটির আয়োজন করা হয় দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর বিশ্বের ধ্বংসপ্রাপ্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে নীতি ও কর্মসূচি নির্ধারণের জন্য। এতে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সরকারের প্রতিনিধি ছাড়াও আন্তর্জাতিক শিক্ষক সংগঠনগুলো, বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়নগুলো এবং অনেক বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধিরা। জাতি গঠনে শিক্ষকদের অবদানের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের লক্ষ্যে শিক্ষকদের অধিকার ও কর্তব্য বিষয়ে ১৩৪টি ধারাযুক্ত যুগান্তকারী একটি সুপারিশমালা সে সম্মেলনে গৃহীত হয়। পরে এটি অনুসমর্থন করে ইউনিসেফ, ইউএনডিপি প্রভৃতি জাতিসংঘের আরও অনেক সংস্থা। বলাবাহুল্য, সুপারিশগুলোর বাস্তবায়নের দায়িত্ব নেয় সরকারগুলো। এভাবে সুপারিশমালাটি পেয়ে যায় বিশেষ আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা। বিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রতি লক্ষ্য রেখে সে দলিলটি প্রণীত হয়। তাই শিক্ষার উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজন অনুভূত হয় অনুরূপ একটি দলিলের। বেশ কয়েক বছর কাজ করে ১৯৭৭-এ ইউনেস্কো/আইএলও ঘোষণা করে ৭৭টি ধারাবিশিষ্ট দ্বিতীয় সুপারিশমালা। সর্বমোট ২১১টি ধারাযুক্ত এ দুটি সুপারিশমালাকে বিবেচনা করা হয় বিশ্ব শিক্ষকদের অধিকার ও মর্যাদার ম্যাগনাকার্টা। তাই প্রথম সুপারিশমালাটি গ্রহণের দিন ৫ অক্টোবরকে ইউনেস্কো ও আইএলও ১৯৮৪ সালে ঘোষণা করে বিশ্ব শিক্ষক দিবস হিসেবে। তখন থেকে ৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস হিসেবে পালিত হয় পৃথিবীর দেশে দেশে। গুণসম্পন্ন শিক্ষার জন্য চাই গুণী শিক্ষক-মর্তব্য, এবার বিশ্ব শিক্ষক ম্যাগনাকার্টা স্বাক্ষরের ৪০তম বার্ষিকী। প্রতি বছর বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদযাপন উপলক্ষে ইউনেস্কো/আইএলও প্রচার করে একটি স্লোগান এবং বাণী। এবার ইউনেস্কোর মহাপরিচালক কোইচিরো মাটসুউরা, আইএলও'র মহাপরিচালক হোয়ান সোমাভিয়া, ইউএনডিপি'র প্রশাসক কেমাল ডারভিস এবং ইউনিসেফ'র কার্যকর পরিচালিকা এনএম ভেনেম্যান যে স্লোগানটি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন সেটি হলো- 'গুণসম্পন্ন শিক্ষার জন্য চাই গুণী শিক্ষক'। আর তাদের যৌথ বাণীর সারমর্ম হলো :শিক্ষা হচ্ছে মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা এবং মানবিক অধিকারের অন্যতম হচ্ছে প্রতিটি নাগরিকের শিক্ষা লাভের অধিকার। সবার জন্য শিক্ষার এই অধিকার বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রতিটি রাষ্ট্রের। বিগত ৪০ বছরে বিশ্বে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। অত্যন্ত দ্রুত বেগে ঘটে চলেছে বিশ্বায়ন। এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এ সময়কালে অনেক অগ্রগতি হলেও এখনও বিশ্বের ১০ কোটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়সী শিশু পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এদের মধ্যে সংখ্যায় বেশি বালিকা। বিশ্বের পূর্ণবয়স্ক (১৫ + বছর) মানুষের প্রায় ১/৫ ভাগ (প্রায় ৮০ কোটি), আদৌ লিখতে-পড়তে পারে না। আর নিবারণ ও নিরাময়যোগ্য রোগে মারা যায় অনেক মানুষ। অনেক শিক্ষকও হতদরিদ্র জীবনযাপন করেন। ক্রমাগত জটিল হয়ে ওঠা, বহুবিধ সংস্কৃতি ও প্রয়োগ কৌশলের লীলাক্ষেত্র ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে যারা বাস করবে, আগামী সেসব প্রজন্মের প্রয়োজনের কথা এখনই বিবেচনা করতে হবে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে তখনকার পরিস্থিতি মোকাবেলা করার উপযোগী করে গড়তে হবে। শিক্ষকরা হচ্ছেন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাণ। উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গুণী শিক্ষক ছাড়া আধুনিক জগতের শিক্ষার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। শিক্ষকতা পেশার প্রতি জাতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন না করলে, শিক্ষকরা উপযুক্ত বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা না পেলে, শিক্ষকরা দরিদ্র ও অসহায় থাকলে, তাদের চাকরির নিরাপত্তা না থাকলে, শিক্ষার উপকরণ মানে ও পরিমাণে যথেষ্ট না হলে শিক্ষকরা তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারে না। ফলে মানসম্পন্ন শিক্ষাদান হয় না। শিক্ষা মানসম্মত না হলে ব্যাহত হয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন। জনগণকে শিক্ষিত না করে দারিদ্র্যতা বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। শিক্ষা বিষয়ক সমস্যা সমাধানে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে, শিক্ষকের ও শিক্ষক সংগঠনের মতামত নিতে হবে। সে কারণে শিক্ষদের চাকরিবিধি হতে হবে গণতান্ত্রিক। উত্তম শিক্ষার জন্য প্রয়োজন উত্তম প্রশিক্ষিত শিক্ষক। আগামী ১০ বছরে সারা বিশ্বে প্রয়োজন হবে কমপক্ষে আরও ১ কোটি ৮০ লাখ নতুন শিক্ষক-শিক্ষিকা। শিক্ষার উন্নয়নের মূল দায়িত্ব নিতে হবে প্রতিটি সরকারকে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশের পরিস্থিতি নিয়ে সবাইকে ভাবতে হবে। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে নিচে মূলত কিছু উপাত্ত নিবেদন করছি।

বাংলাদেশের পরিস্থিতি

বাংলাদেশে ১৩ কোটি ৬০ লাখ মানুষের বাস (ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, টিআইএ'র প্রতিবেদন ২০০৬)। বাংলাদেশের সর্বশেষ সেন্সাস (২০০১) অনুযায়ী শিক্ষার হার ছিল ৪৫.৩% (ইউএনডিপি ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০০৫)। অথচ নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য ১৯৭২ সালেই সময়সীমা বেধে দেয়া হয় ১৯৮০ সাল পর্যন্ত। পরে তা বৃদ্ধি করা হয় ২০০০ সাল পর্যন্ত। বর্তমানে এটি ২০০৬ সাল পর্যন্ত বর্ধিত। এ বছরের অবিশিষ্ট কয় মাসে কেন, আগামী এক দশকেও কি এ লক্ষ্য অর্জিত হবে ?

- দেশে পূর্ণ বয়স্ক মানুষের (১৫ +) মধ্যে ২০০৩ সালে সাক্ষরতার হার ছিল ৪১.১% (ঐ)। আগের উপাত্তের সঙ্গে তুলনা করে বলা যায় যে, ২০০১ থেকে দুই বছরে নিরক্ষরতার হার বেড়েছে ৪.২%! তা হলে কি আমরা আরও পেছনের দিকে যাচ্ছি?
- আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অসম্পূর্ণ রেখে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে প্রায় ২৪% শিশু (ঐ)।
- প্রাথমিক + মাধ্যমিক + উচ্চতর বা তৃতীয় স্তরে ২০০২-০৩ সালে ছাত্রভর্তির হার ছিল মাত্র ৫৩% (উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এর গড় হার ৫৮.৯%) (ঐ)।
- প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ৬০ : ১। এটি দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ (ঐ)। অন্য একটি সূত্রে, ২০০৫ সালে এ অনুপাত ছিল ৬৩ : ১ (যুগান্তর ২৭/১২/০৫)।
- পাঁচ বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে শিক্ষার্থীরা অর্জন করে মাত্র ২য় শ্রেণীর মান (ইউএনডিপি রিপোর্ট ২০০৫)।
- প্রাগুক্ত শিক্ষার্থীদের মাত্র ২% ৫৩টি প্রান্তিক যোগ্যতার মধ্যে ২৭টি অর্জন করে। ৫ম শ্রেণী শেষে তারা গড়ে মাত্র ১৬টিতে দক্ষতা অর্জন করে (যুগান্তর) (ঐ)।
- বিগত ৩০ বছরে শিক্ষার্থী সংখ্যা বেড়েছে বিদ্যালয়ে দুই গুণ আর মাদ্রাসায় ৮ গুণ। শিক্ষার্থী প্রতি ব্যয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২,০০০ টাকা এবং মাদ্রাসায় ৫,০০০ টাকা (প্রফেসর আবুল বারাকাত, বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতি, অক্টোবর ১৭, ২০০৫)।
- ২০০১-০২ সালে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ছিল মোট বাজেটের ১৫.২৭%। এরপর প্রতি বছর কমে কমে ২০০৫-০৬ সালে এটি হয়েছে ১১.৯% (ঐ)। অথচ সরকার শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ করে থাকে বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকে।
- আমাদের জাতীয় উৎপাদনের (জিএনপি) ২.৪% ব্যয় হয় শিক্ষায় (ইউএনডিপি রিপোর্ট ২০০৫)। এটি দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে কম (ভারত ও নেপাল উভয় দেশে এটি ৩.২%, পাকিস্তানে ২.৭) (ঐ)। ইউনেস্কো বহুকাল আগে সুপারিশ করেছিল উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এ আয়ের কমপক্ষে ৭% (উত্তম ৮%) বরাদ্দ করতে হবে।
- শিক্ষার অন্যান্য স্তরে বেতন কেমন আবাস্তব, তার কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যায়। দেশের নন-রেজিস্টার্ড প্রাইমারি শিক্ষকরা সরকারের কাছ থেকে কোন বেতন পান না। হয়ত সে কারণেই ১৯৯৬ সালের ৪,৯০৩টি এ জাতীয় বিদ্যালয়ের মধ্যে ৩,১৩৭টি বন্ধ হয়ে যায় ২০০৩ সালের মধ্যে। কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ছিল মাসে মাত্র ৫০০ টাকা। আন্দোলন করে তারা প্রথমে ৭৫০ এবং এখন ১২০০ টাকা বেতন আদায় করেছেন। এটিও সহজে আদায় হয়নি। তার আগে আত্মহত্যা করেন একজন আন্দোলনকারী কমিউনিটি শিক্ষক নেত্রী। ২২,৬৮৮টি (২০০৩ সালে) রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক বেতন পান মাত্র ১৫০০ টাকা। আর ৩৭,৭১১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সূচনা বেতন মাত্র ৩,১০০ টাকা।
- প্রাইভেট খাতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বাইরে শিক্ষকদের মধ্যে সর্বাধিক বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সম্ভবত পান স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরগণ। দেশের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ড. আবুল বারাকাত হিসাব করে দেখিয়েছেন (২১ এপ্রিল, ২০০৫) যে তিন জন সন্তানকে শিক্ষিত করে, সংসারের অন্যান্য সাধারণ দায়িত্ব পালন করে, ৪৫ বছর চাকরির পর অবসর নিলে একজন প্রফেসর আয় করবেন ১ কোটি ৬৮ লাখ টাকা। আর তিনি ব্যয় করতে বাধ্য হবেন আরও ৯৮ লাখ টাকা। তার মানে তিনি এ টাকা ঋণ করতে বাধ্য হবেন। অতএব অন্যান্য স্তরের শিক্ষকদের কথা না বলাই ভাল। আমরা যারা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কনসালটেন্সি বন্ধ করতে চাই, সাধারণভাবে অন্যান্য স্তরের শিক্ষকদের প্রাইভেট কোচিং বা টিউশনি বন্ধ করতে চাই, বিদেশে পড়তে গিয়ে ফিরে না আসা শিক্ষকদের ফিরিয়ে আনতে চাই, তারা এ অর্থনৈতিক বাস্তবতাটি মনে রাখলে ভাল হবে। সর্বোপরি, গুণী ও মেধাবী ব্যক্তিকে শিক্ষকতা পেশায় আকর্ষিত করতে ও তাকে পেশায় ধরে রাখতে হলে ভাল বেতন ও অন্যান্য সুযোগ দিতে হবে। অন্যথায় গুণসম্পন্ন শিক্ষার আশা স্বপ্ন হয়েই থাকবে।
- শিক্ষক নিয়োগে দলীয় রাজনীতি ও অর্থের বিনিময় বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়েছে।
- বাংলাদেশে শিক্ষা হয়ে পড়েছে পণ্য, উচ্চ মুনাফা লাভের উপকরণ। এ কারণেই দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বিভিন্ন প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশেষত অর্ধশতাধিক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। সেসব স্থানে চড়া দামে নগদ অর্থে বিক্রি হচ্ছে শিক্ষা (শিক্ষা সনদ!)। এ ব্যবসায় জড়িত বেশকিছু আইন প্রণেতা ও রাজনৈতিক নেতা।
- আত্মসম্মানসম্পন্ন প্রতিটি সমাজপতি, প্রতিটি আইন প্রণেতার প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের (সেই সঙ্গে আর্থিক লাভের) কেন্দ্র হিসেবে চাই এক বা একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর কর্তৃত্বপনার সুযোগ। এর সুব্যবস্থা করা হয়েছে এদেশে। ফলে নাভিশ্বাস উঠেছে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার।
- মূলত রাজনৈতিক কারণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এমপিওভুক্ত হয়ে সরকারি সব সুবিধা পাচ্ছে বেশকিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এগুলোতে শিক্ষার পরিবেশ তো নেই-ই, নেই উপযুক্তসংখ্যক শিক্ষার্থী। ফলে এসব প্রতিষ্ঠান থেকে কেউ পরীক্ষায় পাস করে না। এ বছর এদের সংখ্যা হচ্ছে ৭৯১টি।
- শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বায়ত্তশাসন প্রায় বিলীন হতে বসেছে। দলীয় নেতা, মস্তানরা দেশের আইন-কানুন, সব নিয়মনীতি ভেঙে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষত বেসরকারি স্কুল কলেজে। এসব প্রতিষ্ঠানের অনেক শিক্ষক বেআইনিভাবে কর্মচ্যুত হয়েছেন।
- শিক্ষা ব্যবস্থাকে সেক্যুলার করার বদলে মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণা প্রসারের মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের, বিশেষত নির্বাচনে ভোটার লক্ষ্যকে সামনে রেখে। এ লক্ষ্যেই কওমি মাদ্রাসার দাওয়াই হাদিস ডিগ্রিকে মাস্টার্সের সমমর্যাদা দিয়েছে বর্তমান সরকার। আর মাদ্রাসার ফাজিল ও কামিল ডিগ্রিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এসব করতে সরকার প্রচলিত নিয়মের কোন তোয়াক্কা করেনি। কোন দেশেই সরকার এভাবে ডিগ্রির মর্যাদা নির্ধারণ করে না।
- শিক্ষকদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা পদদলিত। নিছক রাজনৈতিক বিশ্বাসের জন্য চাকরি যাওয়ার অনেক ঘটনা ঘটেছে। বেশ কিছু স্বাধীনচেতা, মুক্তচিন্তার অধিকারী শিক্ষকের জীবন আজ বিপন্ন। প্রফেসর হাসান আজিজুল হক এবং ড. জাফর ইকবালের মতো প্রথিতযশা শিক্ষকদের প্রকাশ্যে জীবননাশের হুমকি দিচ্ছে ছাত্র নামধারী কিছু দুর্জন, অথচ সরকার নীরব দর্শক। দেশের শিক্ষক সমাজ বাস করছে প্রচণ্ড এক নিরাপত্তাহীন পরিবেশে।
- এসব হুমকিদাতারা যে ফাঁকা আওয়াজ করে না তার প্রমাণ হচ্ছে ধর্মীয় মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত অধ্যক্ষ গোপালকৃষ্ণ মুহুরি, অধ্যাপক ড. হুমায়ুন আজাদ, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউনুস, অধ্যাপক ড. এস. তাহের এবং অধ্যাপক ড. আফতাব আহমাদ এবং নির্যাতিত অধ্যাপক সনৎ কুমার সাহা। দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় অধ্যক্ষ মুহুরির হত্যাকারীরা ছাড়া অন্য অপরাধীরা এখনও আইনের হাত থেকে রেহাই পেয়ে বহাল তবিয়তে বিরাজ করছে।
- শিক্ষা বিভাগ দুর্নীতিতে দেশে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। আর আমরা জানি যে, আমাদের দেশ দুর্নীতিতে পাঁচ বছর ধরে একনাগাড়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। জাতীয় উৎপাদনের ২% চলে যায় দুর্নীতিতে (টিআই) (ঐ)।
- অপচয় ও ভুয়লফি কাণ্ডে আমাদের শিক্ষা বিভাগের জুড়ি নেই। একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। তথাকথিত একমুখী শিক্ষা চালু করতে গিয়ে ৫২০ কোটি টাকা অপচয় করেছে। অথচ মাত্র ২৮৬ কোটি টাকা হলে বেসরকারি শিক্ষকদের ১০% বেতনবৃদ্ধি নগদে দেয়া যেত, ৫% নগদে ও ৫% বাকিতে (বন্ড) দিতে গিয়ে ছলচাতুরী ও গড়িমসি করতে হতো না।
- আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি বড় ব্যর্থতা হলো বিদ্যমান প্রচণ্ড বৈষম্য। এটি নিয়ে পৃথক আলোচনা দরকার।

এসব সমস্যা সমাধান করতে হলে অনতিবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের ১৭ দফা দাবিনামা, যত দ্রুত সম্ভব করতে হবে শিক্ষা ব্যবস্থার জাতীয়করণ, আর গড়তে হবে একটি আধুনিক, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিভিত্তিক, সেক্যুলার, বৈষম্যহীন ও বিশ্বমানের শিক্ষা ব্যবস্থা। এ লক্ষ্যে লড়ছে এদেশের সচেতন শিক্ষক-কর্মচারী সমাজ।

বিশ্ব শিক্ষক দিবস অমর হোক।

লেখক : সভাপতি বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, অন্যতম আহ্বায়ক বাংলাদেশ শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ এবং সহ-সভাপতি বিশ্ব শিক্ষক ফেডারেশন (WFTU/FISE).